জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, আঞ্চলিক নিরাপত্তা, পরিবেশগত ভারসাম্য
সামাজিক ন্যায়বিচার ও জলবায়ু-সহিষ্ণুতা অর্জনের উদ্দেশ্যে

জ্বালানি খাতে ন্যায্য রূপান্তরে রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার নিশ্চিত করার জন্য

নাগরিক ইশতেহার

bwged

বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মজোট

BELA · BILS · clean (Coastal Livelihood and Environmental Action Network) · Ethical Trading Initiative Bangladesh · LEED · Manusher Jonno Foundation · ReGlobal

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, আঞ্চলিক নিরাপত্তা, পরিবেশগত ভারসাম্য
সামাজিক ন্যায়বিচার ও জলবায়ু-সহিষ্ণুতা অর্জনের উদ্দেশ্যে

জ্বালানি খাতে ন্যায্য রূপান্তরে রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার নিশ্চিত করার জন্য

নাগরিক ইশতেহার

bwged

বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মজোট

© বিডাব্লিউজিইডি, ২০২৫

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬
জ্বালানি খাতে ন্যায্য রূপান্তরে রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার নিশ্চিত করার জন্য
নাগরিক ইশতেহার

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২৫

প্রণয়ন : হাসান মেহেদী, মনোয়ার মোস্তফা, মুনীর উদ্দীন শামীম
ওয়াসিউর রহমান তন্বয়, সুলতান আহমেদ খান ও তাসলিমা ইসলাম শর্মী

গবেষণা : রাইসুল হাসান, কানিজ রাবেয়া, মোহাম্মদ মামুন মিয়া,
মাহবুব আলম প্রিন্স ও শিমনউজ্জামান

প্রকাশক : বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস্)
উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশ কর্মজোট (ক্লিন), এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ (ইটিআই বাংলাদেশ)
লইয়ার্স ফর এনার্জি, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (লীড)
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এবং রিগ্লোবাল

যোগাযোগ : **বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মজোট (বিডাব্লিউজিইডি)**
বাড়ি ৯ক, মল্লিক বাড়ি সড়ক, বয়রা-রায়েরমহল, খুলনা ৯০০০, বাংলাদেশ
ইমেইল : info@cleanbd.org, ওয়েবসাইট : https://www.cleanbd.org/bwged

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত এক যুগ-সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। বিগত দেড় দশকে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহার বাড়লেও এই সময়ে প্রায় এক লাখ ৭২ হাজার কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ, প্রায় দুই লাখ ৫৩ হাজার ২৩২ কোটি টাকা লোকসান এবং প্রতি বছর প্রায় এক লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকার জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানির চাপ দেশের জ্বালানি নিরাপত্তাকেই শুধু হুমকির মুখে ফেলছে না, বরং বৈদেশিক মুদ্রার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। জীবাশ্ম জ্বালানি-নির্ভর বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার কারণে গত দেড় দশকে দেশের কার্বন নির্গমনের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে গেছে, বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে পৃথিবীর সবথেকে দুষিত দেশগুলোর একটি।

এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও প্রয়োজনীয় কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি অত্যন্ত জরুরি। নাগরিকদের জীবনমানের উন্নয়নের জন্য শুধুমাত্র জ্বালানি ও বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, বরং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ খাতের সবুজায়নও জরুরি। যতো দ্রুত আমরা নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের দিকে যেতে পারবো, ততো দ্রুতই ব্যয়বহুল আমদানি-নির্ভরতা থেকে

বেরিয়ে এসে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবো। ফলশ্রুতিতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ কমে আসবে। এই উপলব্ধি থেকে আমাদের সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

সরকার ও রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার ও ভূমিকার উপরই জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের ইতিবাচক পরিবর্তন নির্ভর করে। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের স্ব স্ব নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করবে। যে কারণে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ন্যায্য রূপান্তরের জন্য ১৩ দফা দাবি সম্বলিত এই 'নাগরিক ইশতেহার' প্রণয়ন করা হয়েছে।

নাগরিক দাবিসমূহ

১) জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাত মোকাবেলা, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন 'জাতীয় জ্বালানি নীতি' প্রণয়ন করতে হবে। নতুন জ্বালানি নীতির আলোকে পরিবেশগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে খাতভিত্তিক নীতি এবং মহাপরিকল্পনা পর্যালোচনা ও প্রণয়ন করতে হবে। জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও জলবায়ু-সংশ্লিষ্ট সকল নীতিমালা, পরিকল্পনা, আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের পূর্বে নাগরিক সমাজ ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে হবে।

২) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সম্ভাব্য দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধিমালা পরিমার্জন করে সব ধরনের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক চুক্তি তথ্য অধিকার আইনের আওতায় উন্মুক্ত করতে হবে। প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নাগরিক পরিবীক্ষণের আইনগত স্বীকৃতি দিতে হবে। দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে বিচার এবং বিদ্যুৎ খাত থেকে পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩) জীবাশ্ম জ্বালানি, বিশেষত. কয়লা, গ্যাস ও জ্বালানি তেলের ভর্তুকি ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হবে যাতে শিল্প-কারখানা, বাণিজ্য ও আবাসিক খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার দ্রুততর হয়। সকল শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে। শিল্প ও বাণিজ্য খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রবর্তনের জন্য সহজ শর্তে ঋণ ও কর রেয়াতের সুবিধা দিতে হবে।

৪) কয়লা, গ্যাস ও তেলভিত্তিক নতুন কোনো বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের অনুমোদন দেয়া যাবে না। পুরোনো ও অকার্যকর বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বন্ধ করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিদ্যুৎকেন্দ্র দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে। এসব বিদ্যুৎকেন্দ্রে কর্মরত শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরির আগাম উদ্যোগ

নিতে হবে। যেসব বিদ্যুৎকেন্দ্র পূর্ণ দক্ষতা ও ক্ষমতায় চলতে অক্ষম সেগুলোর ‘ক্যাপসিটি চার্জ’ বাতিল করতে হবে।

৫) নতুন কোনো এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের অনুমোদন দেয়া যাবে না। পুরোনো ও অকার্যকর গ্যাস বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বন্ধ করে সার উৎপাদনে গ্যাস সরবরাহ বাড়াতে হবে। শিল্প-কারখানার জ্বালানি হিশেবে গ্যাসের বদলে বিদ্যুৎ ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে। গ্যাসের লিকেজ ও চোরাই সংযোগ বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং গ্যাসের অপচয় রোধ করার উদ্দেশ্যে সকল খাতে মিটার প্রবর্তন করতে হবে।

৬) ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ, ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়টি সকল নীতিমালা, খাতভিত্তিক পরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। জাতীয় বাজেটে বিদ্যুৎ খাতের কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য বরাদ্দ করতে হবে। সৌরবিদ্যুতের প্যানেল ও ইনভার্টারসহ অন্যান্য যন্ত্রাংশের উপর থেকে ভ্যাট, আমদানি শুল্ক ও অন্যান্য কর শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে।

৭) দেশের জ্বালানি ব্যবহার ও দূষণের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উৎস হলো পরিবহণ খাত। দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ খাতের সবুজায়নের উদ্দেশ্যে বৈদ্যুতিক যানবাহনের (ইভি) আমদানি শুল্ক ও অন্যান্য কর ইঞ্জিনচালিত যানবাহনের তুলনায় কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ কম করতে হবে। এছাড়া উন্নতমানের ব্যাটারির (লিথিয়াম আয়ন, সোডিয়াম-আয়ন, সলিড স্টেট ইত্যাদি) আমদানি কর শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে হবে।

৮) জাতীয় গ্রিডের আধুনিকায়ন করে স্মার্ট গ্রিডে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ‘সূর্যবাড়ি’ কর্মসূচির আওতায় পারিবারিক ছাদভিত্তিক ও কৃষিভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে (৩ কিলোওয়াট পর্যন্ত) নির্মাণ ব্যয়ের কমপক্ষে ২৫ শতাংশ ভর্তুকি এবং ৭০ শতাংশ পর্যন্ত সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। নারী, আদিবাসী, শ্রমজীবী, জেলে ও দরিদ্রদের জন্য ভর্তুকির পরিমাণ আরো ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করতে হবে।

৯) টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা), জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর, সমাজসবো অধিদপ্তর ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে বেকার তরুণ-তরুণী, বিশেষত নারী, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, আদিবাসী ও শ্রমজীবীদের নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ ও সহজ ব্যাংক ঋণ দিয়ে এ খাতে নতুন ২০ লাখ

কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।

১০) ‘উন্নততর প্রযুক্তি’র (Advanced Technology) নামে জ্বালানি হিসেবে অ্যামোনিয়া, কার্বন ক্যাপচার ও সংরক্ষণ (সিসিএস), তরল হাইড্রোজেন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ ও বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ (WTE)-সহ সকল প্রকার ব্যয়বহুল ও এখনো অপ্রমাণিত (unproven) প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে হবে। নগরবর্জ্য কমানো, বর্জ্য শ্রেণিবিন্যাস করে পুনর্ব্যাবহার ও জৈব সার উৎপাদনের মাধ্যমে ‘সার্কুলার সবুজ অর্থনীতি’ বাস্তবায়ন করতে হবে।

১১) নবায়নযোগ্য জ্বালানির বর্জ্য (মেয়াদোত্তীর্ণ সৌর প্যানেল, ব্যাটারি, ইনভার্টার ইত্যাদি) সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পুনর্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রিসাইক্লিং শিল্প গড়ে তুলতে হবে যাতে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে সবুজ অর্থনীতি গড়ে তোলা যায়।

১২) জ্বালানি নীতি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনাসহ সকল প্রকার নীতি ও পরিকল্পনায় নারী, আদিবাসী, শ্রমজীবী, জেলে ও দরিদ্রদের অংশগ্রহণ ও অধিকারের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। নির্মিত জ্বালানি অবকাঠামো ও বিদ্যুৎকেন্দ্রের মুনাফা থেকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে ন্যায্য হিস্যা দিতে হবে। এছাড়া, জ্বালানি ও বিদ্যুৎকেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৩) কৃষকদের জমি সুরক্ষার উদ্দেশ্যে জ্বালানি ও বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে জমি অধিগ্রহণের বদলে দীর্ঘমেয়াদি ইজারা পদ্ধতি চালু করতে হবে যাতে জমির মালিক প্রতি বছর বর্ধিত হারে জমির ভাড়া নিতে পারে। এছাড়া একই জমির বিবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কৃষিবিদ্যুৎ (Agrivoltaics) ও ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ (Floatovoltaics) প্রকল্পে বিশেষ প্রণোদনা দিতে হবে।

ভূমিকা

বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত এক যুগ-সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। দেশের ৯৯.২৫ শতাংশ মানুষ এখন বিদ্যুতের আওতাভুক্ত হয়েছে, মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ গত দেড় দশকে ২২০ ইউনিট থেকে ৬৪০ ইউনিটে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, জ্বালানি সরবরাহের ঝুঁকিও বেড়েছে বহুগুণ। ২০০৮ সাল থেকে বিগত ১৬ বছরে বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালিকদের প্রায় এক লাখ ৭২ হাজার কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ দেয়া হয়েছে।

আমদানিকৃত জীবাশ্ম জ্বালানির খরচ ও ক্যাপাসিটি চার্জ মেটাতে গিয়ে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড গত ১৬ বছরে প্রায় ২ লাখ ৫৩ হাজার ২৩২ কোটি টাকা লোকসানের শিকার হয়েছে। এ লোকসান সামলানোর জন্য জনগণের করের টাকা থেকে প্রায় ২ লাখ ৩৬ হাজার ৮৫৯ কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়া হয়েছে। এসব ভর্তুকির টাকা শেষ পর্যন্ত কিছু অসাধু জ্বালানি ব্যবসায়ীর পকেটে চলে গেছে, যা বিভিন্ন দেশে পাচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এখন প্রতি বছর গড়ে এক লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকার জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানি করতে হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান আমদানি-নির্ভরতা একদিকে যেমন দেশের জ্বালানি নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে, অন্যদিকে তা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করেছে। জীবাশ্ম জ্বালানির

উপর অতি-নির্ভরতার কারণে দেশের কার্বন নির্গমনের পরিমাণও বেড়েছে আশঙ্কাজনক হারে। ২০০৮ সালে বাংলাদেশের মোট কার্বন নির্গমনের পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ৬৮ লাখ টন; গত ১৬ বছরে দ্বিগুণ বেড়ে তা প্রায় ২৮ কোটি ১৪ লাখ টনে পৌঁছেছে। অর্থাৎ মাথাপিছু নির্গমনের পরিমাণ এখন প্রায় ১.৬৬ টন।

একই ভাবে দেশের পরিবেশের উপরও মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। 'বৈশ্বিক পরিবেশ সংরক্ষণ' সূচকে পৃথিবীর ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অবস্থান ১৭৫তম। ঢাকার বায়ুমান পৃথিবীর সবথেকে দুষিত শহরগুলোর অন্যতম; পৃথিবীর বসবাস-অযোগ্য তিনটি শহরের মধ্যে ঢাকা একটি। কয়লা, গ্যাস ও তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো দেশের ২৮ শতাংশ বায়ুদূষণের জন্য দায়ী। দেশের মোট কার্বন নির্গমনের ১৭ শতাংশই বিদ্যুৎ খাত থেকে নির্গত হয়।

রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র ও বাঁশখালী কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের জমি অধিগ্রহণ ও শ্রমিক অসন্তোষকে কেন্দ্র করে কমপক্ষে ১৩ জন স্থানীয় নাগরিক খুনের শিকার হয়েছেন। আহতের সংখ্যা কয়েক শত। জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে বড় সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরুদ্ধেও।

এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও প্রয়োজনীয় কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি অত্যন্ত জরুরি। নাগরিকদের জীবনমানের উন্নয়নের জন্য শুধুমাত্র জ্বালানি ও বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, বরং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ খাতের সবুজায়নও জরুরি। যতো দ্রুত আমরা নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের দিকে যেতে পারবো, ততো দ্রুতই ব্যয়বহুল আমদানি-নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে এসে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবো। ফলশ্রুতিতে বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ কমে আসবে। এই উপলব্ধি থেকে আমাদের সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

সরকার ও রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার ও ভূমিকার উপরই জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের ইতিবাচক পরবর্তন নির্ভর করে। আসন্ন **ত্রয়োদশ** জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের স্ব স্ব নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করবে। যে কারণে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ন্যায্য রূপান্তরের জন্য একটি 'নাগরিক ইশতেহার' প্রণয়ন করা হয়েছে।

এর মূল উদ্দেশ্য হলো, রাজনৈতিক দলসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাতে তারা তাদের স্ব স্ব নির্বাচনী ইশতেহারে সময়োপযোগী প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। এর আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, রাজনৈতিক দলসমূহকে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত নিয়ে খোলা মনে সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা করতে সহযোগিতা করা, যা তাদের স্ব স্ব নির্বাচনী ইশতেহারে লিপিবদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এছাড়া এই ইশতেহারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত নিয়ে সাধারণ নাগরিকদেরও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা আনায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই বিবেচনায়, নাগরিক ইশতেহারে এই বিষয়গুলোকে নাগরিক দাবিনামা হিশেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

জ্বালানি নীতি ও পরিকল্পনা

১৯৯৬ সালের জাতীয় জ্বালানি নীতি সামান্য পরিমার্জন করে 'জ্বালানি নীতি ২০০৪' প্রণয়ন করা হয়। এরপর বিগত ২১ বছরে কোনো জ্বালানি নীতি প্রণয়ন করা হয়নি। কোনো নীতিগত অবস্থান ছাড়াই বিদ্যুৎ খাতে উচ্চাভিলাষী দুটো মহাপরিকল্পনা (২০১০ ও ২০১৬), গ্যাস খাতের মহাপরিকল্পনা (২০১৭), জ্বালানি সাশ্রয় ও সংরক্ষণ মহাপরিকল্পনা (২০১৫) এবং সমন্বিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মহাপরিকল্পনা (২০২৩) প্রণয়ন করা হয়েছে।

এরই মধ্যে কোনো রকম নাগরিক পরামর্শ ছাড়াই প্রণয়ন করা হয়েছে 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ২০২৫'। বাস্তবতা-বিবর্জিত এসব পরিকল্পনার ফলে দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা, অসৎ ব্যবসায়ী ও নীতিহীন রাজনৈতিক নেতাদের লাভ হলেও জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হয়ে গেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ও জাতীয় উন্নয়নে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য :

১) জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাত মোকাবেলা, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'জাতীয় জ্বালানি নীতি' প্রণয়ন করতে হবে। নতুন জ্বালানি নীতির আলোকে পরিবেশগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে খাতভিত্তিক নীতি এবং মহাপরিকল্পনা পর্যালোচনা ও প্রণয়ন করতে হবে। জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও জলবায়ু-সংশ্লিষ্ট সকল নীতিমালা, পরিকল্পনা, আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের পূর্বে নাগরিক সমাজ ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে হবে।

২) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সম্ভাব্য দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধিমালা পরিমার্জন করে সব ধরনের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক চুক্তি তথ্য অধিকার আইনের আওতায় উন্মুক্ত করতে হবে। প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নাগরিক পরিবীক্ষণের আইনগত স্বীকৃতি দিতে হবে। দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে বিচার এবং বিদ্যুৎ খাত থেকে পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

জীবাশ্ম জ্বালানি

উচ্চাভিলাষী অবাস্তব পরিকল্পনার আওতায় কোনো প্রতিযোগিতা ছাড়াই ইচ্ছামতো একের পর এক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চুক্তি করা হয়েছে। এসব চুক্তি প্রশ্নহীন রাখার জন্য ২০১০ সালে প্রণয়ন করা হয় 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন'। এই আইনের অধীনে চাহিদার চেয়ে বেশি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করার ফলে বিদ্যুৎ খাতে অকল্পনীয় অতি-সক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতে সক্ষমতা ছিল ২৭ হাজার ৪১৪ মেগাওয়াট। অপরদিকে, বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ১৬ হাজার ৬০৩ মেগাওয়াট। ফলে, ১০ হাজার ৮১১ মেগাওয়াট অলস রয়ে যায়।

বিদ্যুৎ খাতে চাহিদার ২০ শতাংশ 'রিজার্ভ মার্জিন' রাখার নিয়ম থাকলেও আমাদের দেশে তা ৬৫ শতাংশে পৌঁছে গেছে। এ অলস সম্পদের ঘানি টানতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের অর্থনীতি। সম্প্রতি প্রণীত এনডিসি ৩.০ অনুসারে ২০৩৫ সালে দেশে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা হবে ২৬,২৭৭ মেগাওয়াট। তাই, আগামী ২০৩৫ সাল পর্যন্ত নতুন কোনো বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ না করেও দেশের চাহিদা মেটানো সম্ভব। এ কারণে :

৩) জীবাশ্ম জ্বালানি, বিশেষত. কয়লা, গ্যাস ও জ্বালানি তেলের ভর্তুকি ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হবে যাতে শিল্প-কারখানা, বাণিজ্য ও আবাসিক খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার দ্রুততর হয়। সকল শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে। শিল্প ও বাণিজ্য খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রবর্তনের জন্য সহজ শর্তে ঋণ ও কর রেয়াতের সুবিধা দিতে হবে।

৪) কয়লা, গ্যাস ও তেলভিত্তিক নতুন কোনো বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের অনুমোদন দেয়া যাবে না। পুরোনো ও অকার্যকর বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বন্ধ করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিদ্যুৎকেন্দ্র দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে। এসব বিদ্যুৎকেন্দ্রে কর্মরত শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরির আগাম উদ্যোগ নিতে হবে। যেসব বিদ্যুৎকেন্দ্র পূর্ণ দক্ষতা ও ক্ষমতায় চলতে অক্ষম সেগুলোর 'ক্যাপসিটি চার্জ' বাতিল করতে হবে।

গ্যাস সংকট

বার্ষিক আভ্যন্তরীণ গ্যাস সরবরাহ (বিলিয়ন ঘনফুট)

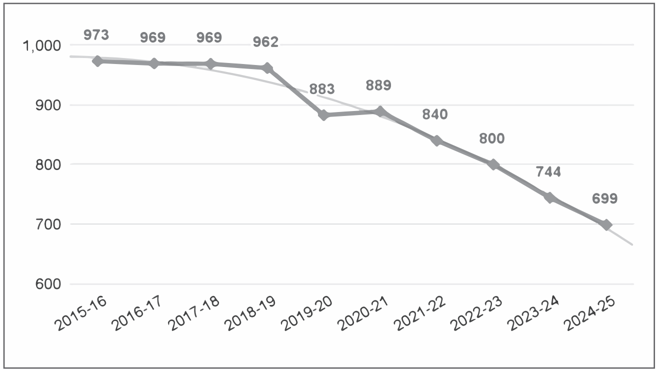

দেশের আভ্যন্তরীণ গ্যাসের মজুদ ক্রমশই কমে আসছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকে ৯৭ হাজার ৩২০ কোটি ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হলেও বিগত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মাত্র ৬৯ হাজার ৮৮০ কোটি ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয়েছে। গত আট বছর ধরে গ্যাসের উৎপাদন প্রতি বছর সাড়ে তিন শতাংশ কমে যাচ্ছে। নতুন কোনো গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত না হলে আগামী ২০৩৫ সাল নাগাদ নিজস্ব গ্যাসের মজুদ ফুরিয়ে যাবে। এসব বিষয় উপেক্ষা করে আমদানিকৃত এলএনজি ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। আবার, বর্ধিত গ্যাসের চাহিদা মেটানোর নামে বেসরকারি এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে যেগুলো প্রতি বছর দুই হাজার কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ নিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া প্রতি ঘনমিটার গ্যাস সাড়ে ৭৯ টাকায় কিনে বিদ্যুৎ খাতে মাত্র সাড়ে ১৫ টাকায় বিক্রি করতে হচ্ছে। এর ফলে, শুধুমাত্র এলএনজি কেনায় প্রতি বছর সাড়ে ৩৫ হাজার কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে। স্থানীয় গ্যাসের মূল্য না বাড়িয়ে এ সংকট মোকাবেলা করতে হবে। সে উদ্দেশ্যে :

৫) নতুন কোনো এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের অনুমোদন দেয়া যাবে না। পুরোনো ও অকার্যকর গ্যাস বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বন্ধ করে শিল্প-কারখানা ও সার উৎপাদনে গ্যাস সরবরাহ বাড়াতে হবে। শিল্প-কারখানার জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের বদলে বিদ্যুৎ ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে। গ্যাসের লিকেজ ও চোরাই সংযোগ বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং গ্যাসের অপচয় রোধ করার উদ্দেশ্যে সকল খাতে মিটার প্রবর্তন করতে হবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি

বাংলাদেশ জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনায় (বিসিপিপি) ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ ও ২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। অথচ, নতুন নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি এবং জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (এনডিসি ৩.০)-তে এই লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ ও ২০৪০ সাল নাগাদ ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। কয়লা ও তেলভিত্তিক বিদ্যুতের তুলনায় এখন সৌরবিদ্যুৎ পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য।

সৌর-বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য দেশে পর্যাপ্ত ভূমি নেই বলে এতদিন ধরে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে, যা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার স্বীকার করেছে। এছাড়া, ২০২৫ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও বিদ্যুৎ খাতের মাত্র ৩ শতাংশ অর্থ নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এদিকে, সৌরবিদ্যুতের প্যানেল ও ইনভার্টারসহ অন্যান্য যন্ত্রাংশের উপর ২৬ শতাংশ থেকে ৫৬ শতাংশ আমদানি শুল্ক ও কর ধার্য করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির এসব বাধা দূর করার উদ্দেশ্যে :

৬) ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ, ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়টি সকল নীতিমালা, খাতভিত্তিক পরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। জাতীয় বাজেটে বিদ্যুৎ খাতের কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য বরাদ্দ করতে হবে। সৌরবিদ্যুতের প্যানেল ও ইনভার্টারসহ অন্যান্য যন্ত্রাংশের উপর থেকে ভ্যাট, আমদানি শুল্ক ও অন্যান্য কর শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে।

৭) দেশের জ্বালানি ব্যবহার ও দূষণের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উৎস হলো পরিবহণ খাত। দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ খাতের সবুজায়নের উদ্দেশ্যে বৈদ্যুতিক যানবাহনের (ইভি) আমদানি শুল্ক ও অন্যান্য কর ইঞ্জিনচালিত যানবাহনের তুলনায় কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ কম করতে হবে। এছাড়া উন্নতমানের ব্যাটারির (লিথিয়াম আয়ন, সোডিয়াম-আয়ন, সলিড স্টেট ইত্যাদি) আমদানি কর শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে হবে।

সূর্যবাড়ি কর্মসূচি

বিগত সরকার খরচে জ্বালানি আমদানির দিকে নজর দেয়ার কারণে বিগত ১৬ বছরে সাড়ে চার শতাংশের বেশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রবর্তন করা যায়নি। এছাড়া স্মার্ট গ্রিড না করার কারণে ১০ শতাংশের বেশি নবায়নযোগ্য উৎসের বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা যাচ্ছে না। তবে, অফগ্রিড নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে এ ধরনের ঝুঁকি নেই। এক্ষেত্রে ব্যাটারি সংযোগ থাকা আবশ্যক।

এক মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন করলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়, তাতে তেল আমদানি কমিয়ে দুই কোটি ৭৫ লাখ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা যায়। ২০ বছর মেয়াদে সাশ্রয় হয় প্রায় ৬০ কোটি টাকা। এছাড়া সাম্প্রতিক গবেষণা অনুসারে প্রতি মেগাওয়াট আবাসিক সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনে ২৬.৬টি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। তাই, অফগ্রিড ও অনগ্রিড দুই দিকেই গুরুত্ব আরোপ করার লক্ষ্যে :

৮) জাতীয় গ্রিডের আধুনিকায়ন করে স্মার্ট গ্রিডে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ‘সূর্যবাড়ি’ কর্মসূচির আওতায় পারিবারিক ছাদভিত্তিক ও কৃষিভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে (৩ কিলোওয়াট পর্যন্ত) নির্মাণ ব্যয়ের কমপক্ষে ২৫ শতাংশ ভর্তুকি এবং ৭০ শতাংশ পর্যন্ত সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। নারী, আদিবাসী, শ্রমজীবী, জেলে ও দরিদ্রদের জন্য ভর্তুকির পরিমাণ আরো ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করতে হবে।

৯) টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা), জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর, সমাজসবো অধিদপ্তর ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে বেকার তরুণ-তরুণী, বিশেষত নারী, আদিবাসী, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও শ্রমজীবীদের নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ ও সহজ ব্যাংক ঋণ দিয়ে এ খাতে নতুন ২০ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।

জলবায়ুর ভুয়া সমাধান

জীবাশ্ম জ্বালানি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ (টাকা/ইউনিট)

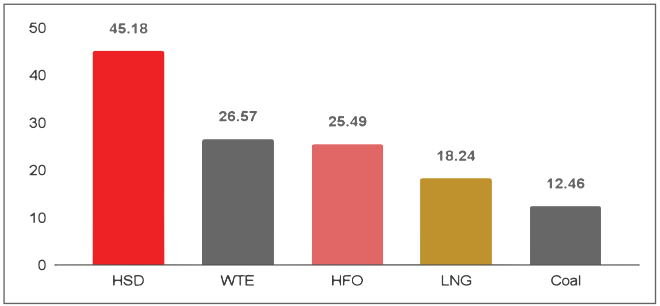

এসব সম্ভাবনা উপেক্ষা করে সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনায় (আইইপিএমপি) ‘নবায়নযোগ্য জ্বালানি’ শব্দগুচ্ছ পাল্টে ‘পরিচ্ছন্ন জ্বালানি’ শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় ‘উন্নততর প্রযুক্তি’ নাম দিয়ে অ্যামোনিয়া, তরল হাইড্রোজেন, কার্বন ক্যাপচার ও সংরক্ষণ (সিসিএস) ইত্যাদি ’ভুয়া প্রযুক্তি’ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের নির্গমন তো কমাবেই না বরং জ্বালানি খাতকে আরো পরনির্ভরশীল করে তুলবে। আইইপিএমপিতে ২০৪১ সাল নাগাদ ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ’পরিচ্ছন্ন জ্বালানি’ প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে, যা বিভ্রান্তিকর এবং বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের বিরোধী। পরস্পরবিরোধী লক্ষ্যমাত্রা এ খাতে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করছে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রবর্তনে বাধা সৃষ্টি করছে। এ বাধা দূর করে `সবুজ বাংলাদেশ’ গড়ে তোলার লক্ষ্যে :

১০) ‘উন্নততর প্রযুক্তি’র (Advanced Technology) নামে জ্বালানি হিশেবে অ্যামোনিয়া, কার্বন ক্যাপচার ও সংরক্ষণ (সিসিএস), তরল হাইড্রোজেন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ ও বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ (WTE)-সহ সকল প্রকার ব্যয়বহুল ও এখনো অপ্রমাণিত (unproven) প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে হবে। নগরবর্জ্য কমানো, বর্জ্য শ্রেণিবিন্যাস করে পুনর্ব্যাবহার ও জৈব সার উৎপাদনের মাধ্যমে ‘সার্কুলার সবুজ অর্থনীতি’ বাস্তবায়ন করতে হবে।

১১) নবায়নযোগ্য জ্বালানির বর্জ্য (মেয়াদোত্তীর্ণ সৌর প্যানেল, ব্যাটারি, ইনভার্টার ইত্যাদি) সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পুনর্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রিসাইক্লিং শিল্প গড়ে তুলতে হবে যাতে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে সবুজ অর্থনীতি গড়ে তোলা যায়।

ন্যায্য রূপান্তর

কৃষিবিদ্যুৎ গ্রামীণ অর্থনীতি আমূল পাল্টে দিতে পারে

নবায়নযোগ্য জ্বালানি (সৌর ও বায়ু) প্রকল্পসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের মেগাপ্রকল্পের জন্য জোরপূর্বক সাধারণ কৃষকদের ভূমি, খাল ও নদী দখল করার অভিযোগ রয়েছে। এর ফলে স্থানীয় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, জেলে ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাঁদের জীবন ও জীবিকা হারিয়ে বাস্তুচ্যুত হয়ে গেছে। আগে প্রণীত জ্বালানি-সংশ্লিষ্ট কোনো নীতি ও পরিকল্পনায় কৃষক, জেলে, শ্রমজীবী, নারী, আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ও অধিকার নিয়ে কোনো অঙ্গীকার করা হয়নি। জ্বালানি রূপান্তরের সময় যেন একই সমস্যা সৃষ্টি না হয়, সে লক্ষ্যে :

১২) জ্বালানি নীতি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনাসহ সকল প্রকার নীতি ও পরিকল্পনায় নারী, আদিবাসী, শ্রমজীবী, জেলে ও দরিদ্রদের অংশগ্রহণ ও অধিকারের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। নির্মিত জ্বালানি অবকাঠামো ও বিদ্যুৎকেন্দ্রের মুনাফা থেকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে ন্যায্য হিস্যা দিতে হবে। এছাড়া, জ্বালানি ও বিদ্যুৎকেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৩) কৃষকদের জমি সুরক্ষার উদ্দেশ্যে জ্বালানি ও বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে জমি অধিগ্রহণের বদলে দীর্ঘমেয়াদি ইজারা পদ্ধতি চালু করতে হবে যাতে জমির মালিক প্রতি বছর বর্ধিত হারে জমির ভাড়া নিতে পারে। এছাড়া একই জমির বিবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কৃষিবিদ্যুৎ (Agrivoltaics) ও ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ (Floatovoltaics) প্রকল্পে বিশেষ প্রণোদনা দিতে হবে।

শেষ কথা

আমরা আশা করি, ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আগামী **ত্রয়োদশ** জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দল ও জোট জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের সবুজ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে খাতটিকে সাধারণ মানুষের জন্য সাশ্রয়ী করা, প্রান্তিক জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার লক্ষ্যে আমাদের দাবিসমূহ নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভূক্ত করে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিবেন।